নিরুপমা বরগোহাঞি ঃ অসমিয়া সাহিত্য এবং সমাজ জীবনে এক আলোকবর্তিকা

বাসুদেব দাস

বাংলা সাহিত্যে আশাপূর্ণা দেবী তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমে যেভাবে নারী জীবনের ব্যথা বেদনা ও বঞ্চনার ইতিহাস তুলে ধরেছেন,অসমিয়াতেও তেমনই কয়েকজন প্রগতিশীল লেখিকার হতে নারী জীবনের বেদনাঘন ইতিহাস ফুটে উঠেছে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রথমেই নিরুপমা ব রগোহাঞির নাম করতে হয়। নিরুপমা বরগোহাঞি ১৯৩২ সনে গুয়াহাটি শহরে জন্মগ্রহন করেন।১৯৫৪ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ এবং ১৯৬৫ সনে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসমিয়া সাহিত্যে এম. এ পাশ করেন। মালিগাঁওয়ের রেলওয়ে স্কুলে শিক্ষয়িত্রীরূপে কর্মজীবন শুরু করে পরবর্তীকালে বেশ কয়েকটি কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৯৫৮ সনে প্রসিদ্ধ লেখক সাংবাদিক হোমেন বরগোহাঞির সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন।১৯৬৮ সনে কলেজের চাকরি ছেড়ে 'সাপ্তাহিক নীলাচল'কাগজে সহকারি সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। অসম আন্দোলনের অন্ধ জাতীয়তাবাদী উন্মাদনার প্রতিবাদ করায় তাকে চাকরি হারাতে হয়। এই মানবতাবাদী লেখিকার ইতিমধ্যেই 'সেই নদী নিরবধি','একজন বুড়ো মানুষ','ইপারর ঘর সিপারর ঘর' ইত্যাদি তেত্রিশ টি উপন্যাস এবং 'সতী','নিরুপমা বরগোহাঞির শ্রেষ্ঠ গল্প' ইত্যাদি দশটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এর বাইরে সাংবাদিকতা ধর্মী নিবন্ধ সংকলন,অনুবাদ গ্রন্থ,ভ্রমণ কাহিনি এবং আত্মজীবনীও রচনা করেন।অসমিয়া তথা ভারতীয় সাহিত্যে এই বিশাল অবদানের জন্য ১৯৮৭ সনে বাঙ্গালোরের 'শাশ্বতী'নামের মহিলা প্রতিষ্ঠান তাকে শাশ্বতী পুরস্কারে সম্মানিত করেন। এর বাইরেও তিনি অসম সাহিত্য সভার 'বাসন্তী দেবী বরদলৈ'পুরস্কার এবং 'হেম বরুয়া' পুরস্কার লাভ করেন।১৯৯৬ সনে লেখিকার 'অভিযাত্রী'উপন্যাসটি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করে। কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে 'অভিযাত্রী' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ পাঠ্য করা হয়েছে।

'সেই নদী নিরবধি', 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর',এবং 'অন্যজীবন'এই ত্রয়ী উপন্যাসে লেখিকার নারী চিন্তার বিবর্তনের একটি আভাস পাওয়া যায়।'সেই নদী নিরবধি'র লক্ষ্মী দুরন্ত,কিন্তু নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় বলে বঞ্চনার বিরুদ্ধেও কোনো অভিযোগ নেই। লক্ষ্মীর সমস্ত অভিযোগ ভাগ্যের বিরুদ্ধে। পগলাদিয়া নদী,তার তীরের জীবন উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নদী তীরবর্তী মানুষের হাসি কান্নার ছবি লেখিকা উপন্যাসে তুলে ধরেছেন ,কিন্তু সেই ছবি অনেকটাই যেন একমাত্রিক হয়ে ওঠেছে। কেন না কাহিনির মূল দ্বন্দ্বের সঙ্গে এর সম্পর্ক নিতান্তই ক্ষীণ। দীপুর প্রেমের উন্মেষ এবং তার করুণ সমাপ্তি -- ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর খেলা,যেখানে পগলাদিয়াও অংশীদার,অথবা বলা যেতে পারে পগলাদিয়াই নিয়তি রূপে লেখিকার মনে ক্রিয়াশীল ছিল। দীপুর জীবনের সীমাহীন দুঃখ এবং চরম আত্মগ্লানির মর্মন্তুদ ছবি যেমন আমাদের মনে করুণার সঞ্চার করে তেমনই লক্ষ্মীর জীবনের বিপুল সম্ভাবনার অপচয় আমাদের ব্যাকুল করে তোলে। দীপু আর লক্ষ্মীর শৈশবের পবিত্র সুন্দর সুখী জীবনের ছবির সঙ্গে যৌবনের ছবির তুলনা যেন লক্ষ্মীর কথাই প্রমাণ করে--' বড় হওয়ার সত্যিই যে কত দুঃখ।' ভাগ্যের চূড়ান্ত বঞ্চনা এই দুটি নিষ্পাপ তরুণ তরুণীর জীবনের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছে। এই স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাবার কাহিনি নিরু পমা ব রগোহাঞি আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। নির্মম বাস্তবের সম্মুখিন হয়ে দীপু অশান্ত হয়ে পড়ে। ভাঙ্গা স্বপ্নের টুকরো জোড়া দেবার করুণ আর্তি উপন্যাসের শেষ অংশকে ভারী করে তুলেছে। ' তার এরকম মনে হতে লাগল সে যেন পুনরায় শৈশবের কয়েকটি মুহূর্ত ফিরে পেতে চলেছে,যখন সে এবং লক্ষ্মী একসঙ্গে দিনরাত এই গ্রামের পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াত।' একইভাবে লক্ষ্মী হৃদয়ের সমস্ত আকুলতা নিয়ে দীপুকে প্রশ্ন করে --' জীবনটাকে পুনরায় নতুনভাবে আরম্ভ করা যায় না কি দীপু? পগলাদিয়াকে যেমন পুনরায় স্রোতের বিপরীতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তেমনই মানুষের জীবনে একবার ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। মানবজীবনের এই চিরসত্য দীপুর অজানা নয়।

উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' প্রথম উপন্যাস 'সেই নদী নিরবধি'র দশ বছর পরে রচিত (১৯৭৯) । নদীকেন্দ্রিক এই আলোচ্য উপন্যাস গ্রাম্যজীবনের পটভূমিতে রচিত। উপন্যাসটিতে ঈর্ষাপূর্ণ গ্রাম্য অর্থনীতির ফলে ভাঙনমুখী অসমিয়া সমাজ,অকৃত্রিম সরল গ্রাম্য জীবনশৈলীর বিপরীতে ধন সর্বস্ব নাগরিক জীবনের হৃদয়হীন,জটিল মানবিক সম্পর্ক ,স্বার্থপরতা ইত্যাদি অমানবীয় মূল্যবোধহীন যান্ত্রিক জীবনের নির্মোহ প্রতিবিম্ব আমাদের চোখের সামনে লেখিকা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। বিশিষ্ট লেখক তথা সমালোচক ডঃ গোবিন্দ প্রসাদ শর্মা উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেন --'এই উপন্যাসে স্বাধীনতার পরে ভারতীয় তথা অসমিয়া সমাজের অর্থনৈতিক নীতির ফলে গ্রামগুলিতে যে ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছিল,তার এক বাস্তব ছবি বর্ণিত হয়েছে। উত্তর স্বাধীনতা কালের গ্রাম্য অর্থনীতির প্রভাব গ্রামগুলিতে এই রূপ দাঁড়াল যে,সেখানে নিম্নশ্রেণির লোকদের দুবেলা দুমুঠো খেয়ে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। এরকম অবস্থায় কীভাবে জীবিকার সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে

অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির লোকের স্রোত বইতে লাগল এবং শহরে সে পুনরায় কীভাবে এক প্রকার নিষ্ঠুর বাস্তবের সম্মুখিন হল,তারই এক জীবন্ত ছবি উপন্যাসটিতে তুলে ধরা হয়েছে। '

উপন্যাসের কেন্দ্রিয় নারী চরিত্র পটেশ্বরী একজন সহজ সরল গ্রামের মেয়ে। পটেশ্বরী রূপবতী,সৌন্দর্যের রাণী। পটেশ্বরীর রূপের চমক গ্রামের অনেক যুবকেরই চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই রূপই পটেশ্বরীর জীবনে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াল। সুদূর রাজস্থান থেকে ব্যবসা উপলক্ষে আগত রমেশ ছেরাউগীর দিল্লিতে পাঠরত ছাত্র পূজন কলেজের বন্ধে বাবার এখানে বেড়াতে আসে। পটেশ্বরীর সৌন্দর্যে মোহিত পূজন একদিন পটেশ্বরীকে নিয়ে পালিয়ে যায়। তবে মোহ কেটে যেতেই পূজন পটেশ্বরীকে হোটেলে ফেলে রেখে রাজস্থানে পালিয়ে যায়। সহায় সম্বলহীন পটেশ্বরীর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। হোটেলে কর্মরত রূপহীন ছবিন পটেশ্বরীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। পটেশ্বরী অতীতের দুঃখ দুর্দশা ভুলে গিয়ে ছবিনের সঙ্গে নতুন করে ঘর বাঁধে। সমস্যার সৃষ্টি হয় অন্যদিক থেকে। হোটেলের ষাট বছর বয়সী মালিকের কুদৃষ্টি পড়ে পটেশ্বরীর প্রতি। মালিকের অস্বাভাবিক , অনাকাঙ্খিত প্রস্তাবে নিরুপায় হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পটেশ্বরী আত্মসমর্পণ করে। সমস্ত কিছু জানার পরে ছবিন এবং পটেশ্বরীর সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে। আটমাসের গর্ভবতী পটেশ্বরীর উপর ছবিন গালিগালাজ ছাড়াও নির্মম শারীরিক অত্যাচার চালায়। ইতিমধ্যে নবীন এবং সাবিত্রীর জন্ম হয়। পটেশ্বরীর দুঃখ দুর্দশায় পরিপূর্ণ জীবনের এখানেই সমাপ্তি ঘটেনি। সাবিত্রীর জন্মের পরে গ্যাস্ট্রিক আলসারে ভুগতে থাকা ছবিনের মৃত্যু হয়। পটেশ্বরী আশ্রয়চ্যুত হয়। লাজলজ্জা ত্যাগ করে নিরুপায় পটেশ্বরী ঢলকুছি গ্রামের পিতৃগৃহে ফিরে আসে। জীবনের অন্তিম পর্বে পুত্রের ক্যাশবাক্স ভেঙ্গে একটি মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যাবার দুঃসংবাদ পটেশ্বরীকে একেবারে শেষ করে দেয়। পটেশ্বরীর জীবন দুঃখ আর বিষাদে শুরু হয়ে বিষাদেই শেষ হয়েছে। নারীবাদী লেখিকা নিরুপমা বরগোহাঞি ফুলের মতো কোমল,ঠুনকো হৃদয়ের পটেশ্বরীর বৃথা অন্বেষণের কাহিনি অত্যন্ত করুণ-মধুর রূপে অংকণ করেছেন। পটেশ্বরী অসমিয়া সাহিত্যে এক বিষাদ নিমজ্জিত সংগ্রামী চরিত্র হয়ে চিরকাল জ্বলজ্বল করবে।

'অন্য জীবন'এ উজান অসমের এক নৈসর্গিক ছবি আমাদের মনকে টেনে নিয়ে যায় ব্রহ্মপুত্রের পার ধরে বহু দূরে। শহরের মেয়ে অণিমা,গ্রামের ছেলে মনোজ,এরা স্বামী স্ত্রী। অণিমা চলেছে গ্রামে শ্বশুর বাড়িতে। মনোজের দ্বিধা,গ্রামের পরিবেশে অণিমা মানিয়ে নিতে পারবে তো? কিছুদিনের মধ্যেই চারুফুটার নৈসর্গিক সৌন্দর্য অনিমাকে মুগ্ধ করে,সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে উঠে। আলাপচারিতার ভেতর দিয়ে একে একে অণিমার কাছে উদঘাটিত হয় গ্রামের নারী সমাজের প্রতি পুরুষের পরম্পরাগত ঔদাসীন্য,অবহেলা ও অত্যাচারের কাহিনি। কোনো প্রশ্ন জাগেনা ,কোনো প্রতিবাদ হয় না,কারণ সংসার অভ্যস্থ নারী সমাজের প্রতি উপেক্ষিত এই জীবন বিন্যাসে। এমনই এক অত্যাচারিত অপূর্ব সুন্দরী নারী রম্ভা খুড়ি। সংসারের যূপকাষ্ঠে বাধ্য ক্রীতদাসীর মতো প্রতিদিন সে স্বামীর পদসেবা করে চলেছে। নিজের পৌরষ জাহির করার জন্যই স্বামী একদিন তাকে হালের মইয়ের সঙ্গে বেঁধে খেতের উপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে দেহটাকে ক্ষতবিক্ষত করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে, দুধের শিশুকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এই কাহিনি শোনার পর অণিমার মন সমস্ত পুরুষ জাতিটার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে জানতে পারে রম্ভাখুড়ি দৈনন্দিন জীবনের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল। অণিমা স্বামী মনোজকে প্রশ্ন করে--''রম্ভাখুড়িকে যখন গ্রামের পথ বেয়ে ক্ষেতের মধ্যে টেনে হিঁচড়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল তখন কোথায় ছিলে তোমরা? গ্রামের একটি মানুষও কি এই অন্যায়ের প্রতিবাদে রাস্তায় বেরিয়ে হতভাগিনীর স্বামীকে নিরস্ত করতে পারল না?' মনোজ এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে নি। অণিমা সর্বত্র রম্ভাখুড়ির অশরীরী উপস্থিতি অনুভব করতে থাকে। টুনটুনির জলে যেখানে রম্ভাখুড়ি আত্মহত্যা করেছিল ,অণিমা আর স্নান করতে পারে না। তার কেবলই মনে হতে থাকে টুনটনির স্ফটিক স্বচ্ছ গভীর জলে এক বঞ্চিত নারীর আত্মা যেন হাহাকার করে চলেছে।

'অভিযাত্রী' উপন্যাসের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে । চন্দ্র প্রভা শইকীয়ানীর ঘটনাবহুল জীবনকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। অসমের নারী মুক্তি আন্দোলনের ক্ষে ত্রে চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানী একটি সুপরিচিত নাম। উত্থান পতনে পরিপূর্ণ চন্দ্রপ্রভার বৈচিত্রময় জীবন মহাত্মা গান্ধী,বিনোবা ভাবে ,আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রমুখ বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছে। জীবনে চলার পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাকে একজন ট্র্যাজিক নায়িকা করে তুলেছে। উপন্যাসের মধ্যে লেখিকা চন্দ্রপ্রভা দেবীর কংগ্রেসে যোগদান,অসমে মহিলা সমিতি গঠন এবং তার বিকাশ দেখান হয়েছে। শৈশব থেকেই চন্দ্রপ্রভা ছিলেন নারীর অধিকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। নারী যে পুরুষ থেকে কোনো দিক থেকেই হীন নয় এই ধারনাই চন্দ্রপ্রভাকে সারাজীবন প্রতিবাদী চরিত্র করে তুলেছে।শৈশব থেকেই চন্দ্রপ্রভার আগ্রহ পড়াশোনার প্রতি,জীবনে কিছু একটা করে দেখানোর তীব্র আকাঙ্খা।

গ্রাম্য পরিবেশে জন্মলাভ করেও তাঁর মনে ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তীব্র এক ব্যাকুলতা। উপন্যাসের প্রথমেই এই কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। চন্দ্রপ্রভা নিজের ছোটবোনকে উদ্দেশ্য করে বলেছে --'কণমাই,বর্ষার দিনগুলিতে কষ্ট করতে হবে। তা নাহলে আমাদের পড়াশোনা হবে না। কষ্ট না করলে জীবনে বড় মানুষ হওয়া যায় না। তোকে তো আমি সর্বদাই বলেছি,আমরা যদি লেখাপড়া না শিখি ,গ্রামের অন্য মহিলাদের মতো আমাদের ও পশুসুলভ জীবন যাপন করতে হবে। কেবল ঘর ঝাড়ু দেওয়া,বাসন ধোওয়া,ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া,ভাত রান্না,তাঁত বোনা --এই সমস্ত করে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি না।' চন্দ্রপ্রভা গ্রামের কাঁদা-জলের মধ্যেই শিক্ষা লাভ করেছে। নিজের পরিবারের প্রতি,গ্রামের প্রতি তাঁর গভীর দায়-বদ্ধতা। এই অনুভূতির পটভূমিতেই ১৯৩৭ সনে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পিতৃভিটা' লেখেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ার এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বর্তমান। মহাত্মা-বিনোভার আদর্শে পরিপুষ্ট চন্দ্রপ্রভা জীবনে অশেষ ত্যাগ করেছেন। বিশেষভাবে অসমের মহিলা সংগঠনগুলি চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ার মতো একজন নেতৃত্বের কাছে গভীরভাবে ঋণী। স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে তাকে একাধিকবার জেলেও যেতে হয়েছে। এভাবেই জীবনের প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনের প্রায় প্রতিটি ছোটবড় কথা উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। চন্দ্রপ্রভার মৃত্যু এবং শ্মশান যাত্রার মাধ্যমে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে। নারীর মানসিক দুর্বলতা এবং এই দুর্বলতাই যে নারীকে পুরুষ থেকে পেছনে পড়ে থাকতে বাধ্য করে তা দণ্ডিনাথ কলিতার সঙ্গে আলোচনার সময় তা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। --" আমরা মেয়েরা যে পেছনে পড়ে রয়েছি ,তার একটা কারণ এই সাহসের অভাব। সাহস না করলে সমস্ত বিষয়ে আমাদের পিছিয়ে পড়তে হবে। আর আমরা তো সময়ের অর্ধেক অংশ ,এই অর্ধাংশ যদি অগ্রসর না হতে না পারে ,আমাদের সমাজও একটা পায়ের এই দুর্বলতার জন্য লেংচে লেংচে এগোবে।' পুরুষ এবং নারীর মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা,ধর্ম-কর্মের পরম্পরাগত বৈষম্যমূলক বিভাজন দেখে কৈশোর কাল থেকেই সমাজের প্রতি চন্দ্রপ্রভা বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। নারীকে অস্পৃশ্য করে রাখা পিতৃপ্রধান সমাজে নারীর সমতা,মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য চন্দ্রপ্রভা প্রতিজ্ঞা করেছিল। শৈশবে ভালুকি গ্রামে মাসির বাড়িতে থেকে পড়তে যাবার সময় আশেপাশের মহিলাদের প্রতিক্রিয়ার কথা মনে পড়ায় পুকুরে সাঁতাররত অবস্থায় বোনের উদ্দেশে সে বলেছে--'ছেলে,ছেলে,ছেলে-- মেয়ে,মেয়ে,মেয়ে,মেয়ে --জন্মের দিন থেকে এই কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার কান পচে গেল। ছেলেদের যেন ঈশ্বর সোণা,রূপো,লোহা ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু দিয়ে তৈরি করেছেন ,আর আমাদের মতো মেয়েদের অতি সুলভ কাদা মাটি দিয়ে গড়েছেন।' জাগরণে,স্বপ্নে,চেতনে অবচেতনে চন্দ্রপ্রভা নারীর উপর করা পুরুষের অবহেলা আর অন্যায় অত্যাচারে মর্মাহত হয়েছেন। চন্দ্রপ্রভার জীবনে জীবন আর সংগ্রাম একাকার হয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনে যেভাবে রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে কঠোর সংগ্রামের জীবন বেছে নিতে হয়েছিল তেমনই সামাজিক জীবনেও তাকে পদে পদে অনাকাঙ্খিত,অপ্রত্যাশিত প্রাচীর অতিক্রম করে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। চন্দ্রপ্রভার জীবনের নানা আদর্শের মধ্যে প্রধান ছিল মেয়েদের সুশিক্ষিত করে তোলা। সামাজিক কুসংস্কার,বাল্যবিবাহ,অস্পৃশ্যতা,জাতিভেদ প্রথা ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধেও চন্দ্রপ্রভাকে তীব্র লড়াই করতে হয়েছিল। রাজবালা দাসের সঙ্গে বরপেটা থাকাকালীন অবস্থায় বরপেটার কীর্তনঘরে নীচ জাতির মানুষ এই অজুহাতে যখন অনেককে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছিল না তখন সেই অন্যায়ের চন্দ্রপ্রভা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। চন্দ্রপ্রভা সম্পর্কে গবেষক ক্ষীরেণ রায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।--'Chandra Prova Saikia has proved herself as the forerunner of female's liberation at a critical period of human history when the conservative society in the state was too harsh to the needs and aspirations of the girls & the women.'(Chandra Prova Saikiani : A symbol of Courage : Khiren Roy) ।লেখিকা নিরুপমা বরগোহাঞি উপন্যাসের ভূমিকা অংশে বলেছেন -- 'অভিযাত্রী উপন্যাস লেখার জন্য আমি এখানে সেখানে কিছু কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করলেও মূল ঘটনা বা তথ্যের কোনো বিকৃতি ঘটাই নি। আসলে চন্দ্রপ্রভার জীবনই উপন্যাসের সমতুল্য,বরং তাঁর জীবন কাহিনি অনুধাবন করে এই আপ্তবাক্য মনে পড়ে যে Facts are stranger than fictions অভিযাত্রীর নায়িকা চন্দ্রপ্রভার ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি উপন্যাস লেখার সময় আমি এতটাই অনুভব করছিলাম যে আমি আর কোনো কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করার প্রয়োজন বোধ করিনি।' দুই খণ্ডের ৩৮৮ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে চন্দ্রপ্রভার অগ্রগতি বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে মহিলা সমিতির দ্বারা নারী প্রগতি আন্দোলন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের বিস্তৃত বর্ণনা উপন্যাসের মূল কাহিনিকে কিছুটা বাধা গ্রস্ত করেছে।

১৯৮৭ সালে রচিত 'গোহাঁনী আই গোসাঁনী আই' উত্তর কামরূপের পটভূমিতে অসম আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত। উপন্যাসের কলাগত দিক থেকে বিচার করলে হয়তো এটি ত্রুটি মুক্ত নয় ,তবে অসম আন্দোলন সম্পর্কে লেখকের ব্যক্তিগত ধ্যানধারনা এতে প্রতিফলিত হওয়ায় এর একটি সামাজিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। উপন্যাসটিতে প্রচুর আত্মজৈবনিক

উপাদান রয়েছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রুণিমা এবং মা গোহাঁনী লেখিকার ধ্যান ধারনার ফসল। কেবল মাত্র অসম অন্দোলনের অমানবিক দিকটার ছবিই নয় ভুলপথে পরিচালিত এই অন্দোলন যে দীর্ঘকাল ধরে অসমে বসবাস করে আসা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যেবিভেদের বীজ বপন করবে সে বিষয়েও তিনি সবাইকে সচেতন করে দিয়েছিলেন। অপু এবং রুণী দুই ভাইবোন। তাদের কথোপকথন,বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে অসম অন্দোলনে বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে। অপু অসম আন্দোলনের সমর্থক। সে মনে করে দীর্ঘকাল ধরে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে অসম যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা শোষিত হয়ে আসছে সেই শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অসম আন্দোলনের পথে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। এদিকে রুণী মনে করে সুদীর্ঘকাল ধরে যে সমস্ত অ-অসমিয়া জনগোষ্ঠী অসমকে মাতৃভূমি জ্ঞানে অসমের ভাষা সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছে তাদের হঠাৎ বিদেশি আখ্যা দিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়াটাকে কিছুতেই মানবিক বলা যেতে পারে না। রুণি মনে করে যে, যে সমস্ত তথাকথিত জাতীয়তাবাদী নেতারা নিজের ছেলেমেয়েদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য প্রতিনিয়ত নিজেদের ভাষা সংস্কৃতিকে অবহেলা করে আসছে তাদের আর যাই হোক দেশপ্রেমিক বলা যায় না। হলধর আর রজব আলী উপন্যাসের দুটি চরিত্র। এই দুজনেই কখন কীভাবে পরিবারেরই একজন হয়ে পড়েছে আজ এতদিন পরে আর রুণী জননী শ্রীমতী গোস্বামী মনেও করতে পারেন না। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে লেখিকার দাদা ডঃ বিনয় কুমার তামুলিকে। ডঃ তামুলি অসম আন্দোলনের ঘোর সমর্থন কারী ছিলেন। এর বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়েছিলেন নিরুপমা বরগোহাঞি। উপন্যাসটির কাহিনি বিন্যাসে এই বিরোধ এবং সমর্থন গতি দান করেছে। উপন্যাসের দুটি প্রধান চরিত্র হলধর আর রজব আলীর সম্পর্কে লেখিকা তার আত্মজীবনী মূলক রচনা 'বিশ্বাস আরু সংশয়ের মাজেদি' গ্রন্থে বলেছেন--''ছয়গাঁওয়ে থাকার সময় দুটি মানুষ আমাদের ঘরের লোক হয়ে উঠেছিল। তার একজন হলধর আর একজন রজব আলী। হলধর ছিল বরগোহাঞির অফিসের পাঙ্খাপুলার। রজব আলী নিজের ক্ষেতের ফসল ছয়গাঁও বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে এলে আমাদের বাড়িতেও শাকসব্জি নিয়ে আসে। তারপরে রজব আলীও হলধরের মতো আমাদের পরিবারেরই একজন হয়ে পড়ে। অসমের বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলনের সময় আমি 'গোহাঁনী আই গোসাঁনী আই'উপন্যাসে আশঙ্কা ব্যক্ত(করেছিলাম যে দুই ভাইয়ের মতো এই যে দুটি বৃদ্ধ শিশু তাদের গোহাঁনী মায়ের কাছে ভালোবাসার অধিকার নিয়ে কাড়াকাড়ি করে ,আজ এই আন্দোলনের ফলে তাদের মনে যদি সাম্প্রাদায়িকতার বিষবাষ্প প্রবেশ করে পরস্পরের পিঠে ছুরি মারার জন্য প্ররোচিত করে? কিন্তু হায় ,আমার সেই আশঙ্কা তখন না হলেও আজ তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। কত রজব আলী আর হলধর কাটাকাটি মারামারি করে মারা গেল।'' উপন্যাসটির শেষে ধ্বনিত হয়েছে প্রচণ্ড আশাবাদ। শ্রীমতী গোস্বামীর তীব্র মানবিকতা বোধে আপ্লুত হয়ে তারই কন্যা রুণী মাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দিত স্বরে বলেছে --'মা,মা তুমি সত্যই মা,প্রত্যেকের মা,হলধরের মা,রজব আলীর মা--পৃথিবীর সমস্ত সন্তানেরই মা।' এ যেন রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের সমাপ্তি অংশেরই প্রতিধ্বনি যেখানে আমরা দেখি গোরা আনন্দময়ীর মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করেছে।

নিরুপমা বরগোহাঞির সৃষ্টির অন্য একটি দিক হল সুগভীর মানবিক চেতনা এবং সামাজিক ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠা। লেখিকার চরিত্রসমূহ সব সময়ই গতিশীল এবং উচ্চ নীতিবোধ সম্পন্ন। আপোষহীন সততা এবং নিপীড়িত মানবতার প্রতি থাকা অকৃত্রিম দরদে উজ্জ্বল। ধনী-দুঃখী,জাতপাত,পুরুষ-মহিলার বিভেদের অবসানের স্বপ্ন দেখা এই চরিত্রগুলির দৃষ্টি ভবিষ্যৎমুখী। বরগোহাঞির উপন্যাস 'ভবিষ্যতের রঙা সূর্য' ১৯৮০ সালে রচিত হয়।

নিরুপমা বরগোহাঞির রাজনৈতিক চিন্তা সাধারণভাবে বামপন্থী। তিনি বিশ্বাস করেন যে জনগণের মুক্তি একমাত্র বামপন্থী আন্দোলনের মাধ্যমেই সম্ভব। জনগণ একতা চায়,দল তার পরিবর্তে জনতাকে বিভক্ত করে চলেছে। লেখিকা কোনোমতেই হতাশাকে প্রশ্রয় দিতে চায় না,বিপ্লবের রক্তরাঙা সূর্য যে ভবিষ্যতে জনগণের জীবন আলোকিত করে তুলবে সে সম্পর্কে লেখক রীতিমতো আশাবাদী। তবে এই সমস্ত কিছুই কেবল মাত্র তাত্ত্বিক আশ্বাসে পরিণত হয়,উপন্যাসের চরিত্র বিকাশের মাধ্যমে তা মূর্ত হয়ে ওঠে না।

'কেকটাসের ফুল' উপন্যাসে নারী জীবনের কথাই বলা হয়েছে। দুটি শিক্ষিতা যুবতি --মানসী এবং পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। সহজ সরল বর্ণণাত্মক ভাষায় নির্মিত কাহিনিটিতে পারিবারিক খুঁটিনাটি ,হোস্টেলের পরিবেশ ,লঘু আলাপ আলোচনার সঙ্গে নারী মনের সন্ধানের প্রয়াস রয়েছে।

'দিনর পাছত দিন' উপন্যাসে দাম্পত্য জীবনের করুণ চিত্র লক্ষ্যণীয়। একজন সাধারণ শিক্ষকের মেয়ে অনুরূপগুণের জোরে ধনী বিচারপতির হাকিম পুত্র মিহিরের সঙ্গে বিয়ে হয়। অনু স্বামীর স্নেহভালোবাসা পরিমণ্ডিত যে মধুর জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল বলাবাহুল্য তা থেকে বঞ্চিত হয়। অচিরেই তার স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। পিতা-মাতার অনুমতি নিয়েই সে এই বিয়েতে

সম্মতি দিয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই তার অভিজ্ঞতা তাকে উপলব্ধি করতে বাধ্য করে যে এই সামাজিক বৈষম্য থাকা দুটো পরিবারের বৈবাহিক বন্ধন কেবল বাহ্যিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাতে অন্তরের ঐশ্বর্য থাকে না। উপন্যাসটি বেশ সুখপাঠ্য।

'এজন বুঢ়া মানুহ' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিজয় ভরালী। রক্ষণশীল পরিবারের যুবক হয়ে তথাকথিত নিচু কুলের মেয়েকে বিয়ে করায় বাড়ির সঙ্গে বিজয় ভরালীর সম্পর্ক ছেদ হয়। একমাত্র পুত্রকে জন্ম দিয়ে পত্নীর মৃত্যু হয়। পত্নী কিনে রেখে যাওয়া গুয়াহাটির জমিতে বিজয় ভরালীর বাড়ি তৈরি করা হয়ে ওঠে না। ছেলে সঞ্জয় ইঞ্জিনিয়ার। কমলা কিনে রাখা জমিতে সাত রুমের একটি সুন্দর বাড়ি তৈরি করে কোণের একটি ঘরে বিজয় কে থাকতে দেওয়া হয়। গ্রন্থপিপাসু বিজয় ভরালী একদিন কেন্সারে আক্রান্ত হয়ে নিঃসঙ্গ জীবনে বই পড়ার আনন্দ থেকেও বঞ্চিত হয়। নিঃসঙ্গ অবস্থার মধ্যে তাঁর দুঃখে পুত্র অকনকে দুঃখিত হতে দেখে বিজয় ভরালী কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করেন। পিতার প্রতি পুত্রের শ্রদ্ধা এবং স্নেহ ভালোবাসা অটুট থাকার উপলব্ধির মাধ্যমে উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বিজয় ভরালী নিষ্ঠাবান প্রেমিক এবং প্রগতিবাদী চিন্তাধারার মানুষ। ইলা এবং কমলার মাধ্যমে নারী চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। পত্নী ইলা ছিলেন সাধারণভাবে শিক্ষিতা সুখী,সহানুভূতি শীল ,স্বার্থত্যাগী সদাসন্তুষ্ট প্রকৃতির মানুষ। অন্যদিকে পুত্রবধূ কমলা আত্মকেন্দ্রিক,উচ্চাভিলাষী এবং কৃত্রিম আধুনিকতার প্রতিনিধি। ইলা এবং কমলার মধ্যে দুই পুরুষের ব্যবধান স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। সঞ্জয়ের চরিত্রে বেদনার তীব্র ক্রিয়া রয়েছে। মায়ের স্মৃতি এবং পিতার প্রতি তার শ্রদ্ধা এবং কর্তব্যবোধ লক্ষ্যণীয়। বিজয় ভরালীর অন্তর্দ্বন্দ্ব উপন্যাসটিকে একটি বিশেষ মাত্রা দান করেছে।

বিদায়ের শেষ বেলায় বিজয় ভরালী তাঁর প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিতে চায়। তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কবিতার দুটো পঙক্তি ধ্বনিত হয়। --'হে উদাসীন পৃথিবী,আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে,তোমার নির্মম পদপ্রান্তে আজ রেখে যাই আমার প্রণতি---।'ধীরে ধীরে এবং যতটা সম্ভব নিঃশব্দে সঞ্জয় পিতার ঘরে প্রবেশ করে। দূর থেকে পিতার মুদে থাকা চোখজোড়া দেখে তার মনে হয় যন্ত্রণার মধ্যেও বাবা বোধহয় কিছুটা ঘুমোচ্ছে। চোখদুটো বুজে অসারভাবে পড়েছিল বিজয় ভরালী। সেদিকে তাকিয়ে সঞ্জয় দেখতে পায় অনেকদিন ধরে না কাটা কাচা পাকা দাড়ির নিচে পিতার গাল দুটো ভেতরে ঢুকে দুপাশে দুটো গর্তের সৃষ্টি করেছে। বন্ধ হয়ে থাকা চোখের গোড়ায় পিঁচুটি জমা হয়েছে। খুব অসহায় ভাবে মুখটা হা হয়ে আছে ,কয়েকটা মাছি হা করা মুখের আশে পাশে ভনভন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ,হাড়-ছাল সর্বস্ব অত্যন্ত শীর্ণ একটা হাত কম্বলের নিচ দিয়ে বেড়িয়ে বিছানার পাশে ঝুলে রয়েছে। পিতার বই সর্বস্ব জীবনে আজ বইগুলো ঘরের এখানে সেখানে অনাদৃতভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সেগুলোর উপরে ধুলোর আস্তরণ। বহুদিন দিন থেকে বাবা বইগুলো স্পর্শ করে নি। আর-আর কোনোদিনই বাবা সেগুলোকে পড়তে পারবে না। হঠাৎ সঞ্জয়ের চোখের কোণায় জল জমা হয়। ঠিক তখনই বিজয় ভরালী চোখ মেলে তাকায় এবং দেখতে পায় শৈশবে পোনা ওরফে সঞ্জয় মায়ের কাছে কোনো কিছু আব্দার করতে গিয়ে যেভাবে কাঁদত আজও এত বছর পরেও তার বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে সঞ্জয় দুহাতে মুখ ঢেকে হাউমাউ করে কেঁদে চলেছে।

উ পন্যাসের পাশাপাশি নিরলস ভাবে নিরুপমা বরগোহাঞি রচনা করেছেন অসংখ্য ছোটগল্প। স্বকীয় বৈশিষ্টে উজ্জ্বল বেশ কিছু হৃদয় স্পর্শী গল্প তিনি লিখেছেন। একজন বিচক্ষণ মনস্তাত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজের বিভিন্ন নরনারীর অর্ন্তজগতে দৃষ্টিপাত করে তাদের জীবনের সুখ দুঃখ ,দ্বন্দ্ব-সংঘাত,আশা আর আশা ভঙ্গের বেদনা তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল ভাবে তুলে ধরেছেন। নিরুপমা বরগোহাঞির গল্পের ক্যানভাস নিম্নবর্গ,মধ্যবিত্ত জীবনের দুঃস্থ নিপীড়িত শোষিত চরিত্রের প্রতিকৃতিতে পরিপূর্ণ। গভীর আদর্শবাদ এবং নীতিবোধে নিষিক্ত লেখিকা সমাজ জীবনের সবগুলো স্তরের ছোট-বড়,অবিচার অন্যায় এবং অশুভ চিন্তাগুলোকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রতিফলিত করে চলেছেন। লেখিকার বিস্তৃত ক্যানভাসে চিত্রিত সমাজের বিশাল প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন চরিত্রগুলোর মধ্যে নারী চরিত্রগুলোর অঙ্কন অত্যন্ত বাস্তবধর্মী এবং জীবন্ত। এই ক্ষেত্রে,পরম্পরাগত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর অবস্থিতিগত সমস্যা,সংঘাত এবং প্রান্তীয় স্থিতিকে সহজ সরল ভাষায় এবং সাবলীল রীতিতে উপস্থাপন করে অসমিয়া সাহিত্যের 'নারী-সত্তা সচেতনতার ধারাটিকে গতি প্রদান করায় লেখিকার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরম্পরাগত পরিকাঠামোতে নারীর অস্তিত্বজনিত সমস্যা এবং সীমাবদ্ধতার বিষয়ে এক দ্বন্দ্বাত্মক পর্যালোচনার মাধ্যমেই নারীবাদী চিন্তার গবেষণা প্রণালী গড়ে ওঠেছিল। বিস্তৃত অধ্যয়নে লক্ষ্য করা যায় যে সার্বিক অর্থে না হলেও নারীর অভিজ্ঞতাসমূহের বিশ্লেষণ এবং নবমূল্যায়ন তথা নারীকে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় এক অপরসত্তা রূপে গণ্য করার প্রবণতাকে প্রতিবাদী চিন্তার দ্বারা প্রতিহত করার প্রচেষ্টার জন্য নিরুপমা বরগোহাঞির সৃষ্টি মানবতাবাদী নারীবাদের সগোত্রীয় হয়ে পড়েছে। ঐতিহাসিক সমাজতাত্বিক দৃষ্টিতে দেখলে তারিণীদেবী,বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী,স্বর্ণলতা বরুয়া,পদ্মাবতী দেবী ফুকননী যে নতুন পথে যাত্রা শুরু

করেছিলেন নিরুপমা বরগোহাঞি তার সার্থক উত্তরাধিকারী। তাঁর নারী চরিত্রগুলিতেও এক ধরনের মানসিক রাজনৈতিক পরিপক্কতা লক্ষ্য করা যায়। লেখিকার প্রথম গল্প 'শান্ত ছোৱালীজনী তাই' নামক গল্প থেকেই নারীমনের এই বিশেষ সংবেদনশীলতা লক্ষ্য করা যায়। পরনির্ভরশীল 'অৱলা' নারীর অবস্থানের বিপরীতে তাঁর বোধসম্পন্ন নারী চরিত্রগুলি সতত স্বনির্ভরশীল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক দায়িত্ব তথা সামাজিক দায়িত্ব পালনেও পিছিয়ে থাকে না। এই প্রসঙ্গে হোমেন বরগোহাঞির মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। --'তাঁর কোনো কোনো গল্পে মেয়েদের প্রেমে পড়েও বা বিয়ের বাজারে সর্বগুণসম্পন্না হয়েও বিয়ে হয় না--তার কারণ পুরোনো দিনের মতো জাত-বিচার বা প্রেমিকের হঠকারিতা নয়,তার কারণ,শিক্ষিত মেয়েদের অনেক সময় এক একটি পরিবারের অন্ন-সংস্থানের দায়িত্ব নিতে হয় এবং পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য নিজের ভবিষ্যৎ এবং হৃদয়াবেগকে বলি দিতে হয়। মেয়েদের এ এক নতুন ব্যক্তিত্ব,নিরুপমা বরগোহাঞির গল্পে মেয়েদের এই নতুন ব্যক্তিত্ব চিত্রিত হয়েছে।' (অসমীয়া গল্প সংকলন,দ্বিতীয় খণ্ড,সম্পাদনা হোমেন বরগোহাঞি,অসম প্রকাশন পরিষদ,দ্বিতীয় সংস্করণ,২০০৩)

১৯৪৯ সনে স্কুলের ছাত্রী অবস্থায় রচনা করেন 'এনথ্রোপলজির সপোনর পিছত 'শীর্ষক বিখ্যাত গল্প। পরবর্তীকালে এটি লেখিকার প্রথম গল্প সংকলন 'অনেক আকাশ'শীর্ষক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। গ্রামের সহজ সরল সমাজের প্রতি নাগরিক মানুষের অবহেলা,সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানসিক সংকীর্ণতা,প্রীতি এবং উমা নামের কলেজের ছাত্রীর মাধ্যমে আদর্শবাদের কথা বলা হয়েছে। নিরুপমা বরগোহাঞির অনেক গল্পেই এভাবে আদর্শবাদের কথা উঠে এসেছে। এরফলে অনেক সময় বক্তব্য প্রাধান্য লাভ করায় শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

আধুনিক শিক্ষিতা নারীর মানসিকতার স্বরূপ এবং দ্বন্দ্ব লেখিকার গল্পে সুন্দরভাবে ফুটে ওঠেছে। 'ঢেকীর সরগ','মধ্যবর্তিনী','আকাশ চোৱা' ইত্যাদি গল্পে শিক্ষিতা নারীর মনস্তত্ব অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। 'আকাশ চোৱা'গল্পের ব্রজনাথ শর্মার গাড়ি শিলঙ থেকে গুয়াহাটি আসার পথে একটি যাত্রীবাহী গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগায় পা ভেঙ্গে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে পড়ে থাকে। শর্মাকে হাসপাতালে তিনমাস থাকতে হবে। সময় যেন কাটতে চায় না। ব্যবসায়ী ব্রজনাথ শর্মা জীবনে ব্যবসা আর টাকা অর্জন ছাড়া কিছুই জানেন না। বইপত্রের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। হাসপাতালের নিরানন্দ দিনগুলোর কথা ভেবে ব্রজনাথ শর্মা কেঁপে ওঠে। হঠাৎ একদিন তাঁর বিদ্রোহিনী নাতনি মাধুরী যাকে সে ইদানিং নাগিনী বলে ডাকে,হাসপাতালে সেই নিরানন্দ ঘরটিতে এসে উপস্থিত হয়। মুহূর্তের মধ্যে হাসপাতালের সেই রুমটির পরিবেশ বদলে যায়। নাগিনী ওরফে মাধুরী ব্রজনাথ শর্মার বড়মেয়ের মেয়ে। এই ফুলের মতো আদরের নাতনিকে ব্রজনাথ শর্মা ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তবে মাধুরী যে সময় বিশেষে বজ্রের মতো কঠোর হয়ে ওঠতে পারে তারও প্রমাণ ব্রজনাথ পেয়েছেন। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী মাধুরী যখন তার অমতে একজন সাধারণ কলেজের অধ্যাপককে বিয়ে করে তখন তিনি মারাত্মক আঘাত পেয়েছিলেন। ব্যবসায়ী ব্রজনাথ শর্মার প্রকৃতির সঙ্গে কোনোদিন কোনো সম্পর্ক ছিল না। জীবনে প্রকৃতির স্পর্শের কোনো প্রয়োজন রয়েছে একথা ভেবে দেখার মতো অবকাশ কোনোদিন পান নি। আজ এতদিন পরে নাতিনি মাধুরীর মাধ্যমে আকাশ দেখে ,আকাশের বিশালতা অনুভব করে মনের মধ্যে এক অদ্ভুত শান্তি অনুভব করেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সারাজীবন অর্থ আর প্রাচুর্যের পেছনে ছুটে চলা মনেপ্রাণে ব্যবসায়ী ব্রজনাথ শর্মা অনুভব করেন মানুষের জীবনে আকাশের প্রয়োজন রয়েছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে আমাদের মন উদার হয়ে ওঠে। এই উপলব্ধি ব্রজনাথ শর্মাকে এক নতুন মানুষ করে তোলে। তাই তিনি অনায়াসে বলতে পারেন --'জ্যোৎস্না রাতের আকাশ যে এই ধরনের অবাক করা তা আমি কোনোদিন জানতাম না। সেই আকাশ দেখে এই পৃথিবীতে রয়েছি বলে মনেই হয় না।'

'নিরুপমা বরগোহাঞির ' ঠিকানা' গল্পে আমাদের দেশের একটি মূল সমস্যা জাতীয় সংহতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। গল্পের মূল চরিত্র যতীন মজুমদার মনেপ্রানে অসমিয়া। যেখানেই যান না কেন তার এই অসমিয়া মনোভাবাপন্ন মানসিকতাকে তিনি ছাড়তে চান না। পরিস্থিতি তাকে একদিন তার সাধের অসম ছেড়ে চাকরিজীবী ছেলের সঙ্গে জয়পুর ,কলকাতা,এবং দিল্লি থাকতে বাধ্য করে। প্রথম প্রথম যতীনবাবু নতুন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। সুদূর জয়পুর,কলকাতা এবং দিল্লিতে বসবাস করার সময় অসমের সেই ঘরোয়া আন্তরিক পরিবেশকে না পেয়ে কেমন যেন জলহীন মীনের অবস্থা হয়েছিল তার। কেবলই মনটা ছটফট করে বেড়াত। কিন্তু মানুষের প্রেম ভালোবাসার জোয়ারে কখন যে তিনি ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতার গণ্ডিকে অতিক্রম করে চলে এসেছেন ,উপলব্ধি করেছেন বিশাল ভারতবর্ষের এক বিরাট ঐক্যকে,আত্মসমর্পণ করেছেন ভালোবাসার কাছে তা তিনি নিজেও জানেন না। মন্ত্রীদের হাজারো বক্তৃতায় যে জাতীয় সংহতির বোধ আমাদের

চেতনাকে স্পর্শ করেনা ,এই গল্প পাঠ করে মুহূর্তে আমাদের মন সেই বোধে উজ্জীবিত হয়ে উঠে। অথচ গল্পটি কোথাও বিন্দুমাত্র বক্তৃতাধর্মী হয়ে উঠে নি। গল্পের শেষে রমেনের সঙ্গে আমরাও যেন বেদনার সঙ্গে নতুন এক ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করি যে ভারতবর্ষকে যতীন মজুমদার জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে অনুভব করেছিলেন।-- 'রমেন চিরকুটটা হাতে নিয়ে প্লাস্টিকের ভেতরে ধূসর হয়ে যাওয়া অক্ষরগুলো ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করে--'যতীন মজুমদার ভারতবর্ষ।'

মাছের কারবারি স্বামীকে অকালে হারিয়ে কুহিলাবাই তার ছেলেমেয়েদের আঁকড়ে ধরে কষ্টে সৃষ্টে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন সফল হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল অসম আন্দোলন। ছেলে যখন বাজারে মাছ বিক্রি করছিল , বড় মাছগুলিকে টুকরো টুকরো করে গ্রাহকের জন্য সাজিয়ে রাখছিল তখনই বাজারের মধ্যে বোমা বিস্ফোরণে তারও দেহ টুকরো টুকরো হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। অতি অখ্যাত অজ্ঞাত তুচ্ছাতিতুচ্ছ কুহিলাবাই সেদিন অসম আন্দোলনের ৬০৬ জন শহিদের কোনো একজনের মা হওয়ার সমবেদনা এবং সম্মান লাভ করেছিল। বাঙালি পাড়ায় মাছ বিক্রি করতে গিয়ে কুহিলা বাই আবিষ্কার করে তারই মতো একজন বাঙালি মহিলা তার আঠারো বছরের ছেলেকে সেদিনের বোমা বিস্ফোরণে হারিয়েছে । তবে তাঁর সঙ্গে মহিলার তফাৎ এখানেই যে সেদিনের বোমা বিস্ফোরণে সে সন্তানকে হারিয়েও কুহিলা বাইয়ের মতো ৬০৬ জন শহিদের কোনো একজনের মা হওয়ার সমবেদনা এবং সম্মান লাভ করতে পারে নি কারণ তার ছেলে মাছ কিনতে গিয়েছিল,বিক্রি করতে নয়। তবে এই বিশ্ব সংসারে একমাত্র এই মহিলাটিকেই কুহিলাবাইয়ের একান্ত আপন জন বলে মনে হয়। মহিলাটির শোকতপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর ইচ্ছা করে তার গলা জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ প্রাণ ভরে কেঁদে নিতে। লেখিকা নিরুপমা বরগোহাঞিের কলমের গুণে 'উৎসব' গল্পে ব্যক্তিগত শোক ক্ষুদ্র জাতীয়তার সীমাকে অতিক্রম করে সার্বজনীন রূপ লাভ করেছে।

মানব মনস্তত্ত্বের জটিলতার এক সার্থক উদাহরণ 'অপচয়'। অনেক বছর ধরে খাঁচায় বন্দি হয়ে থাকা একটি পাখিকে মুক্তি দেবার পরেও সে আকাশে উড়ে বেড়ানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তেমনি একটি নারীর বন্দি মনের উড়ার স্পৃহাকেও দীর্ঘকালীন সামাজিক বন্ধন ধীরে ধীরে ক্ষয় করে ফেলে। গল্পে তাই দেখানো হয়েছে। মানব মনস্তত্ত্বের অবলোকনের সঙ্গে, দার্শনিক জিজ্ঞাসা বা তাত্ত্বিক বীক্ষাকে সহজ সরল রূপে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে মানুষের অর্ন্তলীন সীমাবদ্ধতাকে 'ক্ষণিকা' গল্পে তুলে ধরা হয়েছে। মানুষের জীবনের বোধাতীত অনুভূতিগুলি,আধিভৌতিক অভিজ্ঞতাগুলি কীভাবে ক্ষণিকের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় এবং কীভাবে প্রাত্যহিক তুচ্ছতায় জীবনের উচ্চতর অভীপ্সাগুলো হারিয়ে যায় তাই আলোচ্য গল্পে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে।

'নারী দশকে অকণ'গল্পে সারা বিশ্বে যখন নারী স্বাধীনতা নিয়ে নানা রকম সভা-সমিতি,আলোচনা চলছে তখন ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চলের অসমে অকণ নামে একটি কিশোরী মেয়ের মাধ্যমে লেখিকা আমাদের দেশের নারী সমাজের প্রকৃত অবস্থানের ছবি তুলে ধরেছেন। একদিন রাতে ঘুমের মধ্যে আকস্মিক বন্যার জলে অকণ তাঁর ছোট ভাই এবং মাকে হারায়। বেঁচে থাকে শুধু অকন আর তার বাবা। প্রথম সন্তান ছেলে না হওয়ায় এমনিতেই তার পিতা অকণের ওপর সন্তুষ্ট ছিল না। তার উপর বন্যার জলেস্ত্রী এবং ছেলে ভেসে যাওয়ায় অকণ তার চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। তার কেবলই মনে হতে থাকে --'অকণ বেঁচে রইল আর আমার ছেলেটাই কিনা তলিয়ে গেল। ' এই চিন্তাধারা থেকেই যে কোনো অজুহাতে অকণের উপরে গালিগালাজ বর্ষিত হতে থাকে। --'পোড়ারমুখী,তুই মরে গিয়ে ছেলেটা আমার বেঁচে থাকলে তো কোনো চিন্তা ছিল না। ছেলেটা বন্যায় ভেসে গেল,তুই ভাসতে পারলি না ....? মা ভাইয়ের মাথা চিবিয়ে খেয়ে এখনও দিব্যি বেঁচে থাকতে লজ্জা করে না তোর?' এত অপমান সত্ত্বেও অকণ অন্ধ পিতার সঙ্গে ভিক্ষে করে অন্নের জোগাড় করে। বাসে ভিক্ষে করার সময় অনেকেই বলে 'এতবড় মেয়ে ভিক্ষে চাইতে লজ্জা করে না। খেটে খেতে পারিস না। --এদের উৎপাতে বাসে চড়াও দায়।' প্রকৃতির নিয়ম মেনেই একদিন কিশোরী অকণের শরীরে যৌবন আসে। শরীরটা ধীরে ধীরে ভরে উঠতে থাকে। তখন আবার অকণের পিতার মেয়ে সন্তান জন্ম দেবার জন্য শোক উথলে ওঠে। বারবার মনে হতে থাকে ছেলেটা বেঁচে থাকলে এই বয়সে সে তার দুশ্চিন্তার কারণ না হয়ে বরং অবলম্বন হতে পারত। শেষপর্যন্ত গ্রামের ছেলে সতীশের মাধ্যমে অকণের শহরে এক বাবুর বাড়িতে ঝি এর কাজ জুটে যায়। অকণের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার পিতা তাকে সেখানে জোর করে পাঠিয়ে দেয়। মাস মাইনে ত্রিশ টাকা। এখানেও বৈষম্য। ছেলে হলে পঞ্চাশ টাকা পেত। পিতার চোখের সমস্যা দেখা দিলে অকণের রোজগারের টাকা দিয়েই চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। ধীরে ধীরে অকণের পিতার চোখের আলো নিভে যায়। অকণও ঝি এর চাকরি থেকে বিতাড়িত হয়। রাত যখন গভীর হয়ে আসে তখন অকণের কাছে লোক আসে। এরমধ্যে একদিন গ্রামের দশরথের ছেলে যতীন এসে উপস্থিত হয়। যতীন

আসলে মেয়ে মানুষের মাংসের কেনা বেচার ব্যাপারী। সে তার প্রেমকে পাগলাদিয়া নদীর গভীর খাদে পুঁতে রেখে এসে প্রেমিকা অকণকেই সাপ্লাইয়ের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। অকণের পিতা সমস্ত কিছু জেনেশুনেও প্রতিবাদ করতে ভয় পায় । প্রথমে যতীনের উপর ক্রোধ প্রকাশ করতে চাইলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই তার প্রতিবাদ করার ইচ্ছা নিভে যায়। তাই সে . অনায়াসেই ভাবতে পারে --'যতীনকে মেরে অকণের ভালো রোজগারের পথ নিজের হাতে বন্ধ করে নিজের দুঃখ আর কেন টেনে আনি। তারপরেই তার মনে হয় অকণের মতো এক বজ্জাত বেশ্যাকে কোন দুঃখে যতীন বিয়ে করতে যাবে ?' বাপ হয়ে নিজের মেয়েকে বেশ্যা ভাবতে তার মনে কোনোরকম দ্বিধা হয় না। মানব চরিত্রের এই পতন আমাদের চেতনার গভীরে তীব্র আঘাত করে বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থানকে সুস্পষ্ট করে তোলে।

'মিডাসের ট্র্যাজেডি' গল্পে বরগোহাঞি প্রতিভাশালী,তীক্ষ্ণবুদ্ধির যুবতি বন্দনার অন্তর্দ্বন্দ্বের ছবি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। বহুদিন প্রবাসে কাটিয়ে এসে বন্দনা পিতা বিমল বরুয়ার সঙ্গে অসমে ফিরে কলেজে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হয়। কলেজের বার্ষিক উৎসবগুলোতে বন্দনা আগের সমস্ত রেকর্ড ভেঙ্গে প্রায় প্রতিটি বিষয়েই পুরস্কার লাভ করে। কলকাতায় প্রতিপালিত হওয়ায় বন্দনার ইংরেজি এবং বাংলা দুটো ভাষাতেই দক্ষতা রয়েছে। তর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে 'বেস্টমেন'কাপ লাভ করায় ছাত্র ছাত্রীদের মুখে বন্দনার নাম ছড়িয়ে পড়ে। বন্দনার বুদ্ধি-বৃত্তিকে সবাই শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করে। কলেজের অন্য মেয়েদের কাছে আতঙ্কস্বরূপ অবনীর সঙ্গে বন্দনার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সঙ্গের বান্ধবীরা বন্দনাকে মিডাসের সঙ্গে তুলনা করে। মিডাসের সংস্পর্শে এলে সব কিছুই যেমন সোনা হয়ে উঠত তেমনই বন্দনার সংস্পর্শে এসে অভদ্র প্রকৃতির অবনীও মার্জিত রুচির যুবকে পরিণত হয়। হোস্টেলে লতিকা এবং অন্যান্য মেয়েদের কাছে প্রেমপত্র আসতে দেখে বন্দনা নিজের নারী সত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। শিক্ষা সমাপ্ত করার পর পিতা মাতা তার বিয়ের চেষ্টা করে। কিন্তু এত বুদ্ধিমতী এবং মার্জিত মেয়েকে ও বিয়ে করতে কেউ এগিয়ে আসে না। এক সময়ের প্রেমিক অরবিন্দ সেনকে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বন্দনা চিঠি লিখলে তার উত্তরে অরবিন্দ সেন বন্দনার প্রস্তাবকে অস্বীকার করে লিখে--'তুমি আমাকে ক্ষমা কর বন্দনা,তুমি আমার শ্রদ্ধার পাত্রী। অতীতে অমাদের ঘনিষ্ঠ দিনগুলোতে তুমি বোধহয় আমাকে ভুল বুঝেছিলে। ....আমরা দুজন খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম সত্য,কিন্তু তাকে কি প্রেম বলে? তুমি যে একটি মেয়ে সেই অনুভূতি আমার একদিন ও জাগে নি। তোমাকে অদ্ভুত ধরনে সবসময় আমার 'আইডিয়া' বলেই মনে হত। আমার জন্য সাধারণ কোনো মেয়েই উপযুক্ত হবে। তোমার মতো একটি মেয়েকে দৈনন্দিন জীবনের রক্ত মাংসের বাস্তবতায় নামিয়ে আনার কথা কল্পনাও করতে পারি না। ....অতীতের তোমার বুদ্ধিদীপ্ত বন্ধুত্বের সাহচর্য আমার কাছে চিরকাল মূল্যবান সম্পদ হয়ে থাকবে।' বন্দনার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ,প্রাণচাঞ্চল্য এবং বুদ্ধিমত্তাই বিয়ের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্থিব কামনা-বাসনা,জৈব তৃষ্ণাকে অস্বীকার করে বুদ্ধি-বৃত্তির ঐশ্বর্যকে প্রাধান্য দিলে তা অনেক সময় জীবনে ট্র্যাজেডি বহন করে আনে। একজন প্রেমাতুরা নারীর অপূর্ণ আকাঙ্খার করুণ পরিণতি অত্যন্ত মনোরমভাবে গল্পে চিত্রিত হয়েছে। তাছাড়া পুরুষ প্রধান সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ সর্বদা নিজের চেয়ে কম বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন সাধারণ নারীকে যে জীবন সঙ্গিনী হিসেবে কামনা করে সেকথাও গল্পে ফুটে ওঠেছে।

দক্ষিণ কামরূপের কলহী পারের সমাজ জীবন নিরুপমা বরগোহাঞির লেখায় বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ সাল। এই চার বছর বরগোহাঞি দম্পতি ছয়গাঁওয়ে ছিলেন। গ্রামের মাজপারার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে কলহী নামে ছোট্ট একটি নদী। নিরুপমা বরগোহাঞির 'জয় পরাজয়' গল্পের নায়িকা --যার আধারে পরবর্তীকালে নির্মিত হয় 'মীমাংসা' নামে অবিস্মরণীয় চলচ্চিত্র--এই কলহীপারেরই গৃহবধূ।

১৯৮৭ সালে রচিত 'অন্যজীবন' উপন্যাসটিতেও আমরা কলহীপারের কথা পাই। ঔপন্যাসিকের ভাষায় 'শহরে আজন্ম লালিতা পালিতা হলেও অণিমা যে গ্রাম দেখেনি তা নয়। কলেজের সোসিয়েল সার্ভিসের দলের সঙ্গে দক্ষিণ কামরূপের একটি গ্রামে গিয়ে ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে একটা গোটা দিন সেখানে থাকার অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে গ্রাম সম্পর্কে তার একটি ধারণা গড়ে উঠেছিল।

আমরা লক্ষ্য করি কলহীপারের সমাজ জীবন সারা জীবন ধরে নিরুপমা বরগোহাঞিকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। অন্তত তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে কলহীপরীয়া সমাজ। লেখিকা নিজেও একথা অকপটে স্বীকার করেছেন।--'ছয়গাঁওয়ের জীবন যাত্রার পরে সময় কলহীর জলের মতোই অনেকটা বয়ে গেছে। তবুও ছয়গাঁওয়ের স্মৃতি আমার জীবনে অন্যান্য জায়গা থেকে অনেক তীব্র,কারণ সেখানকার জীবনটাই ছিল মাঝেমধ্যে অত্যন্ত বিরক্তকর হয়েও বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ (বিশ্বাস আরু সংশয়) ।

নিরুপমা বরগোহাঞির সৃষ্টির অন্যতম বৈশিষ্ট হল সুগভীর মানবিক চেতনা এবং সামাজিক ন্যায়ের প্রতি সুগভীর নিষ্ঠা। ধনী-দরিদ্র,জাতপাত,স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ দূরীভূত করে এক নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্নে লেখিকা মশগুল। তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও অপার মমত্ববোধ।

বাসুদেব দাস
আশীর্বাদ অ্যাপার্টমেন্ট,১০ যশোহর রোড,সেন্ট্রাল জেল বাস স্টপের বিপরীতে
ফ্ল্যাট নং-৪জি,৪র্থ ফ্লোর ,কলকাতা --৭০০০২৮
৯৭৪৮৪২১৩৪১(মোবাইল)
basudev.das08@gmail.com